গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৯ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৪ - ১০ নভেম্বর ২০১৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

পঞ্চম শ্রেণিতে পাশ-ফেল চালু আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বিজয়

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৮ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেছেন,

সকলেই জানেন, শিশু-কিশোরদের শিক্ষার পক্ষে সর্বনাশা 'অটোমেটিক প্রমোশন' প্রথা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও গণসংগঠন একটানা ৪০ বছর পশ্চিমবাংলায় লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছে। এছাড়াও সারা দেশ জুড়ে আন্দোলনও আমরা সংগঠিত করেছি। কংগ্রেস, বিজেপি, সি পি এম, তৃণমূল— কেন্দ্র ও রাজ্যের সকল দলের সরকারের বিরুদ্ধেই আমাদের আন্দোলন করতে হয়েছে। গত ২০১২ সালের ১৪ মার্চ প্রায় চার কোটি গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকপত্র নিয়ে পার্লামেন্টে ৫০ সহস্রাধিক মানুষের বিক্ষোভ অভিযান সংগঠিত হয় এস ইউ সি আই (সি)-র আহ্বানেই। বর্তমানেও এই দাবিতে রাজ্যে রাজ্যে আন্দোলন চলছে।

২৭ অক্টোবর। কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা

এই ধারাবাহিক গণআন্দোলনের ফলেই কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে পঞ্চম শ্রেণি থেকে পাশফেল প্রথা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য অন্যান্য রাজ্যের জনগণ ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার এখনও চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত অর্থাৎ শিশুদের শিক্ষার গোড়াতেই সর্বনাশা অটোমেটিক প্রমোশন প্রথা বাতিল করেনি। ফলে শিক্ষার স্বার্থে এই আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অবিলম্বে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বস্তরে পাশফেল প্রথা চালু করার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি।

হাজার অঙ্ক কষেও অর্থনীতির সংকটের সমাধান পাচ্ছেন না পণ্ডিতরা

যন্ত্রের কি প্রাণ আছে? চিন্তা করার শক্তি আছে? সকলেই বলবেন, না নেই। যত উন্নতই হোক, যন্ত্রকে যদি কেউ কাজে না লাগায় তবে তার কোনও মূল্যই নেই। তাই বিশ্বব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট জিম কিম যখন তাঁর সংস্থার এক গবেষণার ফলাফলের উল্লেখ করে বলেন, উন্নত প্রযুক্তিই ভারতে ৬৯ শতাংশ চাকরি কেড়ে নেবে, তখন তিনি পূর্ণ সত্য বলেন না। যেহেতু যন্ত্রের প্রাণ নেই, তাই যন্ত্র জিমের কথার প্রতিবাদ করে বলতে পারে না, না, এই বিরাট কর্মসংকোচনের জন্য আমি দায়ী নই, যারা আসলে দায়ী তাদের কথা আপনি বলছেন না, বরং গোপন করছেন।

প্রযুক্তির কারণে ভারতে ৬৯ শতাংশ ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা করছেন বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তা। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার এভাবেই শ্রমজীবী মানুষকে ভিখারি করছে, পরজীবী মালিকদের মুনাফাকে স্ফীত করছে

একটি যন্ত্র বহু জনের কাজ করে দিতে পারে। অনেক কষ্টসাধ্য, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যন্ত্রের সাহায্যে সহজে হয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই যন্ত্রের প্রয়োগে শ্রমিকদের আনন্দ হওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় ঘটে ঠিক বিপরীত। শ্রমিকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ পুঁজিপতিরা নতুন যন্ত্র নিয়ে আসে শ্রমিকদের কষ্টসাধ্য পরিশ্রমকে কমানোর জন্য নয়, অনেক শ্রমিকের বদলে একটি যন্ত্র দিয়ে কাজ করিয়ে শ্রমিকের মজুরির জন্য খরচ কমাতে। এভাবে মজুরি বাবদ খরচ কমিয়েই মালিকরা তাদের মুনাফা বাড়ায়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল শ্রমিক-ছাঁটাই। সেই ফলের কথাই বলেছেন বিশ্বব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুখপাত্র সংবাদমাধ্যমের সম্পাদককেও এই ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা স্বীকার করতে হচ্ছে যে, উন্নত প্রযুক্তির এই ব্যবহার হয়ত উৎপাদন বাড়াবে, কিন্তু একই সঙ্গে কর্মসংকোচনের দ্বারা তা আর্থিক বৈষম্যকেও বাড়িয়ে তুলবে। প্রতি বছর যে লক্ষ লক্ষ কর্মক্ষম যুব-বাহিনী কাজের বাজারে ঢুকছে, যদি তাদের কাজ যন্ত্রেই করে দেয়, আর তারা কর্মহীন অবস্থাতেই থেকে যায়, তবে তা এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্ম দেবে। কারণ কর্মহীনতা এই বিরাট যুব-বাহিনীর

সাতের পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা গোপন কোন মতলবে

কলকাতা সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলাগুলিতে ডেঙ্গু মহামারী রূপ নিচ্ছে— এ নিয়ে রাজ্যবাসীর মনে একটা উৎকণ্ঠা সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি এবং বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলিতে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভিড় করছেন। বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা এবং ডেঙ্গুতে মৃত্যুর ঘটনাও। কলকাতার বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালের সুপার স্বয়ং ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। তাঁর হাসপাতালে বর্তমানে ১০০ জনেরও বেশি ডেঙ্গু রোগী ভর্তি। হাসপাতালের পরিসংখ্যান বলছে, কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে আসা চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে আগস্টে ৭২৫ জন, সেপ্টেম্বরে ১০০৭ জন, অক্টোবরে (২৪ তারিখ পর্যন্ত) ৭৮১ জনের রক্তে ডেঙ্গু ধরা পড়েছে।

অথচ সরকার ও পুর প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা বলে যাচ্ছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী, যাঁর অধীনে স্বাস্থ্য দপ্তরও রয়েছে, তিনি এসব নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত বলে মনে হচ্ছে না। হাজার হাজার ডেঙ্গু রোগীর আত্মীয়স্বজন যখন তাঁদের প্রিয়জনকে বাঁচাতে দিশাহারা, তখন তিনি দুর্গাপুজার উৎসবকে দশদিন ধরে পালনের নির্দেশ দিয়ে, বিসর্জনের জাঁকজমকপূর্ণ কার্নিভালের আয়োজন করে, 'আহারে বাংলা' ভোজনোৎসব করে

দুয়ের পাতায় দেখুন

শতবর্ষ পরেও যে মহান বিপ্লবের শিক্ষা শোষণমুক্তির পথ দেখায়

দেশে দেশে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণে জর্জরিত মেহনতি জনসাধারণের মুক্তিসাধনের যে গুরুদায়িত্ব ইতিহাস এ যুগে যথার্থ সাম্যবাদীদের উপর অর্পণ করেছে, নভেম্বর বিপ্লব দিবস প্রতি বছর সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়। এবার আমরা তার শতবর্ষ উদযাপনে নিয়োজিত হচ্ছি। সারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের কাছে এই শতবর্ষ পালন নিছক কিছু অনুষ্ঠান নয়। এ হল আগামী দিনের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনে অতীতের বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাগুলিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তা থেকে শিক্ষা নেওয়া। ১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর বিপ্লব যা বিশ্বপুঁজিবাদের ব্যূহভেদ করে রাশিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই ঘটনা হঠাৎ করে ঘটেনি। বিপ্লবী তত্ত্বকে কীভাবে যথার্থ রূপে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়, তার এক বিস্ময়কর উদাহরণ হল নভেম্বর বিপ্লব। মানবসমাজের অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ করে রাখা

নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

শোষণমূলক পুঁজিবাদী শাসনের শেকল ছিঁড়ে এই বিপ্লব পিছিয়ে-পড়া রাশিয়াকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। দেশে দেশে সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলন সফলভাবে গড়ে তুলতে হলে মহান নভেম্বর বিপ্লব থেকে আমাদের শিক্ষা নিতেই হবে।

মহান বিপ্লবী দার্শনিক কার্ল মার্কস সমাজ বিবর্তনের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংস ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন, সর্বহারাদের ঐক্যবদ্ধ করে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করে

চারের পাতায় দেখুন

মিথ্যা মামলায় ডাক্তারদের ফাঁসানো হলে চিকিৎসা ব্যবস্থাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে

সম্প্রতি চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বীকৃত নিয়ম মেনে রোগীকে পরীক্ষা করার ঘটনাকে বিকৃত করে শ্লীলতাহানির মামলায় ফাঁসিয়ে রাজ্যের বর্ষীয়ান, স্বনামধন্য এবং জনদরদি চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলী এবং সল্টলেকের এক বর্ষীয়ান ও জনদরদি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তিমিরকান্তি দাস সহ বেশ কয়েকজন চিকিৎসককে পুলিশ জামিন অযোগ্যধারায় গ্রেফতার করেছে।

২৬ অক্টোবর কলকাতার এন আর এস মেডিকেল কলেজের সামনে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় এ রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সুনির্দিষ্টভাবে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, এই ঘটনাগুলিতে পুলিশ নিশ্চিতভাবে ৩৫৪ ধারা এবং নাবালিকাদের শ্লীলতাহানি প্রতিরোধ আইনের (পকসো) অপব্যবহার করেছে।

তাঁরা বলেন, এরপর কি পুলিশই ঠিক করে দেবে ডাক্তাররা রোগী বা রোগিণীকে কেমন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন! মহিলা রোগীকে শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সময় তার মা বা কোনও আত্মীয়া উপস্থিত থাকলেও পুলিশ বা থানার মর্জির উপরই কি মনে করবে চিকিৎসকের হয়রানি, সম্মানহানি এবং শাস্তি নির্ভর করবে! কর্মরত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সাথে কথা বলা বা কোনও মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ নেওয়া অথবা চিকিৎসকের উপর কোনও রাগ মেটাতে বা অন্য কোনও গূঢ় উদ্দেশ্যে এই অভিযোগ আনা হচ্ছে কি না তার সঠিক তদন্ত করে দেখার দায় কি নেই পুলিশকর্তাদের!

প্রয়োজনে রোগী বা রোগিণীর শরীরে হাত দিয়ে পরীক্ষা না করলে বহু রোগ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এজন্য সবচেয়ে বেশি ভুগতে হবে রোগীকেই। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে বহু চিকিৎসক শারীরিক পরীক্ষা না করেই দামি ডায়গনোস্টিক টেস্ট লিখে দিতে বাধ্য হবেন, ফলে চিকিৎসার খরচ বহুগুণ বেড়ে যাবে।

চিকিৎসকরা বলেন, কোথাও হাসপাতাল, নার্সিংহোম বা ডাক্তারের চেম্বারে অনৈতিক ঘটনা ঘটলে সেই অসামাজিক জীবদের তদন্ত সাপেক্ষে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে। এ কথা ঠিক যে আর পাঁচটা গুরুত্বপূর্ণ পেশার মতো, স্বার্থপর ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির যুগে চিকিৎসা পেশারও অধঃপতন ঘটেছে —তেমনই বহু চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী আজও এই ক্ষয়িষ্ণু বাতাবরণের মধ্যেও যে সামাজিক কর্তব্য পালন করে চলেছেন ও মেডিকেল এথিকসের মর্যাদাকে রক্ষা করছেন তা সমানভাবে স্মরণীয়।

সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার অধঃপতন, স্বাস্থ্যকে পণ্য হিসাবে ঘোষণা করা, চিকিৎসা পরিষেবাকে ক্রেতা সুরক্ষা আইনের অন্তর্ভুক্ত করা সহ জনস্বার্থ বিরোধী সরকারি স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণের ফলেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যার নিদারুণ পরিণতি আজ ডাক্তার-রোগীর সম্পর্কটি হয়ে উঠেছে সাপে-নেউলের সম্পর্কের মতো। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পণ্যায়নের স্বার্থে সরকার ক্রমাগত অস্বাস্থ্যকর ও ত্রুটিপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবার দায় সুকৌশলে ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর চাপিয়ে চলেছে।

এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন, প্রাক্তন সাংসদ ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ডাঃ তরুণ মণ্ডল। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত,

আটের পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা গোপন কোন মতলবে

একের পাতার পর

রাজ্যবাসীকে মাতাতে ব্যস্ত। তাঁর স্বাস্থ্যদপ্তর সংবাদমাধ্যমে ডেঙ্গু নিয়ে তথ্য জানানো বন্ধ করেছে প্রায় এক মাস। এলাকায় এলাকায় মশা মারার তেল দিতে এবং সচেতনতা গড়ে তুলতে বাড়ি বাড়ি যে পুরকর্মীদের দেখা যেত, তাদেরও অনেক ক্ষেত্রেই এলাকাবাসীরা দেখতে পাচ্ছেন না। ফগিং মেশিন দিয়ে মশার ধোঁয়া ছড়ানোও চোখে পড়ছে না। সামগ্রিকভাবে বর্ষার শুরুতে ডেঙ্গু রোগে মৃত্যুর খবর সংবাদমাধ্যমে আসার ফলে যতটুকু তৎপরতা পুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেখা গিয়েছিল তথ্য গোপন করার সাথে সাথে তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু সবচেয়ে যে বিষয়টি নিয়ে মানুষের মধ্যে ভয়ঙ্কর উদ্বেগ কাজ করছে তা হল সরকারি হাসপাতালে ও ক্লিনিকগুলিতে টি সি, ডি সি, ই এস আর, প্লেটলেট কমার হার এবং ম্যালেরিয়া টেস্ট করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ডেঙ্গু রোগের নির্ণায়ক পরীক্ষা এন এস-ওয়ান করা হচ্ছে না। ফলে দ্রুত প্লেটলেট নেমে গিয়ে রোগী মারা গেলে তাঁরা মৃত্যুর কারণ লিখছেন 'অজানা জ্বর'। আবার অনেকে পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর আস্থা রাখতে না পেরে বিপুল টাকা খরচ করে বেসরকারি ল্যাবে ছুটতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু গরিব নিম্নবিত্ত ঘরের মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। অভিযোগ উঠছে যে, সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে উপর থেকে এমন নির্দেশ দেওয়া আছে যে, ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা এবং ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা কম দেখাতে ডেঙ্গু নির্ণয় পরীক্ষা এড়িয়ে গিয়ে শুধু প্লেটলেট কমার হারের উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু এই তথ্য গোপনের কারণ কী? আসলে ডেঙ্গু সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও কার্যকরী পরিকাঠামো স্বাস্থ্যদপ্তর বা পুরসভাগুলির নেই। সরকারি উদ্যোগে ডেঙ্গু রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা কম জায়গাতেই আছে। আবার যেখানে আছে সেখানেও পর্যাপ্ত পরিমাণে কিটের ব্যবস্থা নেই। সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে প্লেটলেটের ঘাটতি থাকায় তা নিয়ে চলছে কালোবাজারি। প্রতিটি পুরসভায় পতঙ্গবিদ এবং উপযুক্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী না থাকার ফলে এলাকায় এলাকায় ডেঙ্গু মশা এডিস ঈজিপ্টাই-এর লার্ভা নিধনের ব্যবস্থাটি কার্যকরী হচ্ছে না। এই দুর্বল পরিকাঠামো নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকতেই সরকারের এই ধরনের গোপনীয়তা— ঠিক যেমনটি পূর্বতন সিপিএম সরকার করত।

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা কেন? অর্থাভাব? মেলায়, খেলায়, শাসক দলের ভাবমূর্তিতে পালিশ লাগাতে অপরিমেয় অর্থ ব্যয়ে সে অভাব তো বোঝা যায় না! আসলে মানুষের প্রতি দরদবোধ, দায়বদ্ধতার অভাবই শাসকদের এমন অমানুষে পরিণত করেছে। যার মাশুল দিচ্ছে সাধারণ মানুষ মৃত্যুমিছিলে।

বালুরঘাটে বিক্ষোভ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ডেঙ্গুর প্রকোপ ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সপ্তাহে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। জেলা ও ব্লক হাসপাতালগুলিতে বহু রোগী ভর্তি রয়েছেন। প্রশাসন চরম উদাসীন। এই অবস্থার প্রতিকারের দাবিতে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি ২৪ অক্টোবর জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তার আগে তিন শতাধিক মোটরভ্যান চালকের এক মিছিল সংগঠনের সম্পাদক সাগর মোদক, যুগ্ম সম্পাদক জগদীশ সরকার ও অমৃত বর্মনের নেতৃত্বে বালুরঘাট শহর পরিক্রমা করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে ৭ জনের এক প্রতিনিধি দল এ ডি এম-এর হাতে দাবিপত্র তুলে দিলে তিনি ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

জীবনাবসান

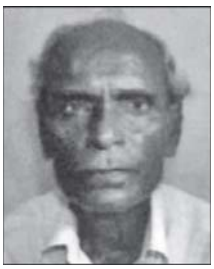

পুরুলিয়া জেলার শাঁকা পঞ্চায়েতের গোপীনাথপুর গ্রামের এস ইউ সি আই (সি)-র প্রবীণ পার্টি কর্মী কমরেড ইয়াকুব আনসারী ২ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কয়েক বছর আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর অপারেশন হয়। তারপর থেকেই তিনি অসুস্থ শরীর নিয়ে চলছিলেন। সম্প্রতি হঠাৎ অসুস্থ হলে তাঁকে সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মরদেহ বাড়ি নিয়ে এলে দলের নেতা-কর্মীরা মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সত্তরের দশকে এ আই কে কে এম এসের সদস্য সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচি চলাকালীন জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড শৈলেন বাউরীর মাধ্যমে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। সম্পন্ন চাষী পরিবারের সদস্য হওয়া হত্ত্বেও তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় নিজের জীবন পরিচালনায় ব্রতী হন। ধীরে ধীরে তিনি এলাকায় এস ইউ সি আই (সি) কর্মী হিসাবে পরিচিত হন। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় আর্থিক সংকটে পড়লেও তিনি হাসিমুখে দলের কাজ করে গেছেন। সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালে দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেসে তিনি দলের সদস্য পদ লাভ করেন এবং শাঁকা-বাবুগ্রাম লোকাল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন ও প্রতিবাদী চরিত্র এলাকার মানুষকে আকৃষ্ট করে। ১৯৯৩ সালে তিনি এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী হিসাবে গ্রামসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং স্বচ্ছতার সাথে ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জমি দান করে যান।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তিনি দলের খোঁজখবর নিয়েছেন। এলাকায় বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন সৎ, নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল।

কমরেড ইয়াকুব আনসারী লাল সেলাম

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর ১ নং ব্লকের নারায়ণীতলা অঞ্চলের এস ইউ সি আই (সি) সদস্য কমরেড সুধাংশুকুমার সাহা ৫ অক্টোবর এক পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অজয় সাহা, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস সুশীল মণ্ডল, পিন্টু ঘোষ এবং লোকাল কমিটির সদস্য সহ বহু সাধারণ মানুষ তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হন এবং মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে পাথেয় করে সত্তরের দশকে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন। খুবই সাধারণ জীবনযাপন করতেন, পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি গণদাবী ও পার্টির বই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। নির্বাচনের সময় খুব গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতেন বয়সজনিত বাধা অতিক্রম করে। প্রবীণ বয়সেও তিনি ২৪ এপ্রিল দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশে ও ৫ আগস্ট মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ সভায় কলকাতার কর্মসূচিতে প্রতি বছর যোগ দিতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন বিশিষ্ট কর্মীকে হারাল।

কমরেড সুধাংশুকুমার সাহা লাল সেলাম

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন
এই নাকি 'সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র'

হিলারি ক্লিন্টন না ডোনাল্ড ট্রাম্প, কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদ দখল করবেন তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে তুমুল চর্চা চলছে। রিপাবলিকান দলের ধনকুবের প্রার্থী ট্রাম্পের নানা বির্তকিত মন্তব্য প্রায়ই মিডিয়ার মুখ্য সংবাদ হয়ে উঠেছে। অন্য দিকে প্রাক্তন বিদেশ সচিব ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী হিলারি ক্লিন্টন যদি নির্বাচনে জেতেন তিনি হবেন প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট। তাই নিয়েও সরগরম করার চেষ্টা হচ্ছে নির্বাচনী আসর। প্রাক্তন বিদেশ সচিব হিসাবে তিনি মার্কিন যুদ্ধ পরিকল্পনায়, মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে পেটোয়া সরকার গঠনে যে আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছেন তা নাকি 'গণতন্ত্রের স্বার্থে' 'সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গড়তে'ই করেছেন। এ সব কথাও হিলারির নির্বাচনী প্রচারে সুকৌশলে আনা হয়েছে। আগামী ৮ নভেম্বর নির্বাচন। লক্ষ করার বিষয়, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই টানা এক বছর প্রচারের আলোয় থেকেছেন। রিপাবলিকান, ডেমোক্র্যাট ছাড়া আর কোনও দল বা ব্যক্তি নির্বাচনী আসরে আছে কি না, তাদের বক্তব্যই বা কী, সে বিষয়ে কোনও প্রচার নেই। তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বহুত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতির চিহ্নমাত্র যে মার্কিন ব্যবস্থায় নেই তা আবার দেখা গেল। দেখা গেল, বুর্জোয়াদের পছন্দের দ্বিদলীয় রাজনীতি চলছে বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে। এই আমেরিকাই অবশ্য বিশ্বে গণতন্ত্রের স্বঘোষিত অভিভাবক।

নির্বাচনী প্রচারে তথাকথিত গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার কোনও নীতি নিয়ে একটা কথাও উচ্চারিত হয়নি। দেশের জনগণের সামনে মূল সমস্যাগুলি কী তা চিহ্নিত করে সমাধানের রাস্তা দেখানোর কোনও চেষ্টা এই দুই সর্বোচ্চ প্রচারপ্রাপ্ত প্রার্থীর মধ্যে দেখা যায়নি। তাঁরা শুধু ব্যস্ত থাকলেন ব্যক্তিগত কুৎসা, পরস্পরের কেচ্ছা কেলেঙ্কারির চর্চায়। প্রচারের এই নিম্নমান রুচিশীল মানুষকে পীড়া দিয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প মাঝে মধ্যে অর্থনীতির বেহাল দশা থেকে দেশকে উদ্ধারের পথ হিসাবে চরম দক্ষিণপন্থার আশ্রয় নিয়ে জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, মুসলিম বিদ্বেষ, নারীবিদ্বেষ ইত্যাদির রাস্তা নিয়েছেন। এই বৈষম্যমূলক বক্তব্য সুস্থ মানুষের বিরক্তির উদ্রেক করেছে।

আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় ট্রাম্পের হাতে ছিল না? পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ইঞ্জিন বলা হয় যে আমেরিকাকে সেখানে বেকার বাহিনী প্রতিদিন বাড়ছে। শ্রমিকদের বেতন ক্রমাগত কমছে, চাকরির নিরাপত্তা নেই। অস্থায়ী শ্রমিক বাড়ছে হু হু করে। দুনিয়ায় সব পুঁজিবাদী দেশের যুবকদের কাছে মোটা মাইনের চাকরির স্বপ্ন ফেরি করে যে দেশ, সেখানকার অর্থনীতির হাল নড়বড়ে হয়ে গেছে। অসাম্য বাড়ছে চূড়ান্ত হারে। সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে যে দেশের নাকি গর্ব ছিল, সেখানে অবসরপ্রাপ্ত নাগরিকদের সুযোগ সুবিধায় চলছে ব্যাপক কাটছাঁট। শিক্ষা-স্বাস্থ্যে সরকারি বাজেট বরাদ্দ ক্রমাগত নিম্নমুখী। এসব নিয়ে ক্লিন্টন বা ট্রাম্প কেউই মুখ খোলেননি। এগুলি বাদ দিয়ে নির্বাচন হয়?

যে আমেরিকাকে বলা হয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান, সেখানে ব্যক্তিগত সব জিনিসের উপর নজরদারি চালাচ্ছে রাষ্ট্র। তুচ্ছ কারণে যখন তখন তল্লাশি চলছে। মার্কিন জেলগুলোতে বন্দির সংখ্যা বাড়ছে ভয়াবহভাবে। স্বাধীনতার বড়াই করা দেশটিতে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কোনও রকম আন্দোলন বরদাস্ত করবে না সরকার। ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনকারীদের শীতের রাতে ক্যাম্প থেকে টেনে-হিঁচড়ে বার করে পুলিশি নির্যাতন চালাতে কোনও দ্বিধা করেনি ব্যক্তি স্বাধীনতার ধ্বজাধারীরা। নির্বাচনে এই সব জ্বলন্ত সামাজিক রাজনৈতিক আর্থিক সমস্যা নিয়ে একটি বাক্যও খরচ হয়নি। মার্কিন জনগণের এই নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও সুযোগ রাখা হয়নি। এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতিতে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। কিছুদিন আগে 'নো ক্যাপিটালিজম', 'উই আর নাইন্টিনাইন' স্লোগানের ভিত্তিতে জনগণের বিক্ষোভে পশ্চিমী দুনিয়া উত্তাল হয়েছিল। বুর্জোয়ারা আতঙ্কিত হয়েছিল। সেই বিক্ষোভ চাপা দিতেই আমেরিকা ও ইউরোপের সব দেশে দক্ষিণপন্থী শক্তিকে মদত দিতে কোটি কোটি ডলার খরচ করে এদের ঢালাও প্রচার শুরু হয়। এই চলছে গণতন্ত্রের নামে।

দুনিয়াজুড়ে পুঁজিবাদের অমোঘ সংকট থেকে মানুষ যখন পরিত্রাণের পথ খুঁজছে, পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের আদর্শ আঁকড়ে ধরতে চাইছে, তখন পুঁজিপতিরা পিঠ বাঁচাতে এভাবে ট্রাম্প, হিলারিদের মতো হয় কট্টর জাতীয়তাবাদী, নয়তো দেশপ্রেমিক মুখোশ সাপ্লাই করে। শোষণমূলক কাঠামো উচ্ছেদ করতে খেটে খাওয়া মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধ না হয় তাই এই ভণ্ড জাতীয়তাবাদীরা বিদ্বেষ, বিভেদ, বিচ্ছিন্নতার রাজনীতিতে মানুষকে মাতিয়ে রাখে। আমাদের দেশে নরেন্দ্র মোদি, রাহুল গান্ধিরা যেমন এখন সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী। তাঁদের হাতেই এ দেশের মোক্ষলাভ হবে বলে জোর প্রচার! পুঁজিবাদী সব দেশের রাজনীতি এখন এই চক্রেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

মানুষকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই ধরনের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য প্রচার চালানো হয়। দ্বিদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থার মধ্যে চক্রাকারে হয় ট্রাম্প না হয় হিলারির মতো প্রার্থীদের ভোট দিতে বাধ্য করা হয়। এক দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জন্মালে তখন বিকল্প হিসাবে আর এক দল খাড়া করে রাখা হয়েছে। এর বাইরে নয়।

ট্রাম্প বা হিলারি ক্লিন্টন তাই কেউই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক নীতি নিয়ে কোনও গভীর বক্তব্যের দিকেই যাননি। এই দুই দলের লড়াই আসলে মার্কিন পুঁজির নিজেদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিয়ে। হিলারি বা ট্রাম্প যেই জিতুক, মার্কিন রাষ্ট্রের যুদ্ধ ব্যবসা বাড়বে। শ্রমিকদের মজুরি কমবে, অসাম্য বাড়বে। জনগণের উপর প্রতিনিয়ত পুলিশি নজরদারি, হেনস্থা চলতে থাকবে। এই হল বিশ্বের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের স্বর্গরাজ্য আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সর্বোত্তম নমুনা!

ছাত্রী হত্যার প্রতিবাদে ধুবুলিয়ায় বিক্ষোভ

নদিয়ার ধুবুলিয়ায় রাজপুর গ্রামে স্কুলছাত্রী অন্বেষা বিশ্বাসের (১৬) দেহ গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় ১৪ অক্টোবর। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে এম এস এস-এর জেলা সম্পাদক কমরেড লক্ষ্মী মাইতি এবং ডি এস ও-র জেলা সম্পাদক কমরেড বিমান কর্মকার ওই গ্রামে যান এবং ওই দিনই থানায় ডেপুটেশন দিয়ে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। কিন্তু ১২ দিন পার হয়ে গেলেও পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার না করায় ২৪ অক্টোবর এম এস এস এবং ডি এস ও-র নেতৃত্বে চার শতাধিক মহিলা ও ছাত্র-যুবক মিছিল করে জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরে যান। প্রথমে বাধা দিলেও বিক্ষোভের চাপে পুলিশ প্রতিনিধি দলকে স্মারকলিপি দেওয়ার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। এস পি অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রতি বছর ৬ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ চিকিৎসার খরচ জোগাতে না পেরে দারিদ্রসীমার নিচে চলে যাচ্ছে
স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ কমাচ্ছে বিজেপি সরকার

'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কী, তা জেলা হাসপাতাল থেকে রেফার হয়ে কলকাতার হাসপাতাল ঘুরে কোনওক্রমে একটির মেঝেতে জায়গা পাওয়া গুরুতর অসুস্থ রোগীর পরিজনরা না বুঝলে 'আধুনিক' ভারতের প্রবক্তা বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা রাগ করতে পারেন, কিন্তু বিষয়টি ততটা দোষের হবে বলে মনে হয় না। 'আচ্ছে দিন, আচ্ছে দিন' করে ঐ নেতা-মন্ত্রীরা যতই চিৎকার জুড়ুন, চিকিৎসা ব্যবস্থার হাল কেমন বুঝলেই বাকি পরিষেবার হাল বুঝতেও অসুবিধা হয় না।

বর্তমানে এ দেশে চিকিৎসার খরচ জোগাতে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর দারিদ্রসীমার নিচে চলে যান। সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে চিকিৎসাক্ষেত্র পুঁজিপতিদের অবাধ লুঠের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মতোই বর্তমানের বিজেপি সরকার স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে দেশের অসংখ্য মানুষকে। যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, নিউমোনিয়া, ডায়েরিয়া, বাতের মতো রোগে এ দেশ বিশ্বের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অথচ বিজেপি সরকার 'আচ্ছে দিনের' বিজ্ঞাপনেই শুধু খরচ করে ১০০ কোটি টাকার বেশি। ভারতে বছরে যে কুড়ি লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয়, তার বেশিরভাগটাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপুষ্টির কারণে। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হারে ভারতের অবস্থান দারিদ্রপীড়িত আফ্রিকার দেশগুলিরও (কোমোরস ও ঘানা) উপরে। এ হেন ভারতকে বিশ্বের মধ্যে 'মেডিকেল ট্যুরিজম'-এর প্রাণকেন্দ্র করতে তৎপরতার অভাব নেই সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নানা দেশের ধনী ব্যক্তিরা চিকিৎসা করাতে এসে বেড়ানোর সুযোগ পাবেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সূচক অনুযায়ী, বিশ্বের ১৮৮টি দেশের তালিকায় ভারতের স্থান ১৪৩তম। হাসপাতাল পরিষেবা অত্যন্ত নিম্নমানের। ১ হাজার ৬৭৪ জন রোগী পিছু রয়েছেন মাত্র ১ জন চিকিৎসক। এমনই হতদীর্ণ অবস্থা!

সাধারণ মানুষকে ন্যূনতম চিকিৎসা দিতে সরকারের টাকা নেই বলে মন্ত্রীরা সবসময় বলেন, অথচ ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে বাজেটে দেশের ধনীদের জন্য ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হয়েছে ৫ লক্ষ ৫১ হাজার ২০০ কোটি টাকা।

স্বাস্থ্যের অধিকার একটা দেশের প্রতিটি নাগরিকের ন্যূনতম অধিকার। '২০১০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য' চালু করার উদ্দেশ্যে যোজনা কমিশন একটি উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল গঠন করেছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ার ডাঃ শ্রীনাথ রেড্ডি। রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছিল, স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বরাদ্দ দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার শেষে জিডিপির ১.৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে অন্তত ২.৫ শতাংশ এবং ২০২২ সালের মধ্যে অন্তত ৩ শতাংশ করা হোক। ওষুধ কেনায় সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে সবার জন্য নিশ্চিত করা হোক বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ। সরকারেরই নিয়োজিত এই কমিটির প্রায় কোনও সুপারিশই মানেনি সরকার। উল্টে মোদি সরকার স্বাস্থ্যে বরাদ্দ কমিয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে বাজেটে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ ছিল ৩৯ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ সালে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৯৫৭ কোটি টাকা। বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ দেওয়া তো দূরের কথা, একশো আটটি জীবনদায়ী ওষুধের ওপর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে সরকারি নিয়ন্ত্রণ। ভারতকে 'শক্তিশালী অর্থনীতির' দেশ বলা হয়। অথচ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ জিডিপি-র মাত্র ১.০৪ শতাংশ, বিশ্বে যার গড় ৫ শতাংশ।

মাল্টি-স্পেশালিটি বা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কথা অহরহ শোনা যায় শাসক দলের নেতা-নেত্রী এবং মন্ত্রীদের গলায়। বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বা সরকারি সুপার স্পেশালিটি বিভাগে যাবতীয় পরিষেবা থাকার কথা, থাকার কথা সার্বিক চিকিৎসার পরিবেশ। তা আছে কি? যেখানে যৎসামান্য এ ধরনের বিভাগও রয়েছে, তাও পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের ২০ শতাংশেরও বেশি নিয়োগ হয়নি। নানা হাসপাতাল থেকে মেডিকেল অফিসারদের হঠাৎ হঠাৎ বদলি করে সেখানে নিয়োগ করা হচ্ছে। তাঁরা হাসপাতালের পরিস্থিতি বুঝতে না বুঝতেই আবার অন্য জায়গায় বদলির নোটিশ পাচ্ছেন। সরকারি কর্তাদের মর্জিতে নিয়োগ নিয়ে চলছে ছেলেখেলা। মরণাপন্ন রোগীও মাসের পর মাস চিকিৎসা করাতে পারছেন না। উপরন্তু সুপার স্পেশালিটি ব্যবস্থাপনায় বাড়তি বিপুল খরচের বোঝা বইবার সাধ্য নেই সাধারণ মানুষের। ফলে ঝাঁ চকচকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুদৃশ্য বিল্ডিং নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তদের হাতছানি দিলেও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত এরা। ফলে না সরকারি হাসপাতাল না বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি, বিশাল সংখ্যক মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সরকার খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১৫ তৈরি করেছে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। এতে বিমানির্ভর স্বাস্থ্য নীতি নেওয়া হয়েছে, যার মূল কথা হল চিকিৎসার খরচ রোগীকেই বহন করতে হবে। খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির বিরোধিতা করেছে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনকারী সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম। তারা জনমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ, স্বাস্থ্যকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া, উন্নতমানের ওষুধ বিনা পয়সায় সরবরাহ করা, স্বাস্থ্য বাজেটে কমপক্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ ব্যয় করা, স্বাস্থ্য ও মেডিকেল শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করার দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

সরকার সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পুঁজিপতিদের মুনাফা করার অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত করেছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে। মানোন্নয়নের এই মূল ক্ষেত্রটি বাদ দিয়ে মানুষের কেমন উন্নয়ন করছে তারা?

নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

একের পাতার পর

দেয় খোদ বুর্জোয়া সমাজ এবং পরিণতিতে দুই বিরোধাত্মক শ্রেণির মধ্যে শ্রেণিসংগ্রামের সূচনা হয়। এর ফলে সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রথমে সমাজতন্ত্র ও পরে সাম্যবাদের দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে চলে মানুষ। যতদিন পর্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বস্তুজগৎ ও ভাবজগতে ব্যক্তিমালিকানার অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই শ্রেণিসংগ্রাম চলতে থাকবে। পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাশ্রেণির উত্থানের ঘটনাকে সমাজের 'ক্ষত' হিসাবে না দেখে মার্কসই প্রথম বলেছিলেন যে, এর ফলে সমাজ তার প্রধান দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হবে। তাঁর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নামক দর্শনে সমাজ অগ্রগতির এই ধারাটিকে চিহ্নিত করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, এই পরিবর্তন কোনও কল্পিত বিষয় নয়, এর ভিত্তি হল বিজ্ঞান। বিশ্বের সর্বহারা জনসাধারণও মার্কসবাদী দর্শনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অমোঘ হাতিয়ার। ক্রমে কার্ল মার্কসের শিক্ষা গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল এবং ধীরে ধীরে শ্রমিকশ্রেণিকে জাগিয়ে তুলল। ১৮৫৪ সালে কার্ল মার্কসের নেতৃত্বে গঠিত হল আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সংগঠন — 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস্ অ্যাসোসিয়েশন'।

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়া

ইতিমধ্যে স্বৈরাচারী জার শাসিত রাশিয়ায় ধীরে ধীরে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছিল। মার্কসের শিক্ষা ক্রমে সেদেশেও পৌঁছল। লেনিনের কথায় — "মার্কস ও এঙ্গেলস রুশ ভাষা জানতেন, বইপত্রও পড়তেন। রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁদের খুবই আগ্রহ ছিল এবং সে দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ রাখতেন" (ভলিউম ২, পৃঃ ১৯)। মার্কসবাদী গ্রুপগুলির আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত রাশিয়ায় জারবিরোধী আন্দোলনে মূলত 'নারদনিকবাদে'রই প্রভাব ছিল। নারদনিকরা জারতন্ত্রের উচ্ছেদ চেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মনে করত, সন্ত্রাস সৃষ্টি ও ব্যক্তিহত্যার দ্বারাই তা করা যাবে। নারদনিকরা বিশ্বাস করত, জারতন্ত্রের উচ্ছেদে অল্প কিছু সাহসী মানুষের সক্রিয় বীরত্বপূর্ণ ভূমিকাই যথেষ্ট, জনগণের ভূমিকা তেমন নেই। মহান স্ট্যালিনের ভাষায় নারদনিক তত্ত্বের ভিত্তি ছিল — 'অ্যাকটিভ হিরোস অ্যান্ড প্যাসিভ মব'। বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা এবং সেজন্য তাদের নিজস্ব বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজন নারদনিকরা অস্বীকার করত। ফলে তাদের তত্ত্ব বিপ্লবের পরিপন্থী ছিল।

সেদেশে মার্কসবাদের সংস্পর্শে প্রথম আসেন প্লেখানভ এবং রাশিয়ার বুকে মার্কসবাদের একজন অসাধারণ প্রচারক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। যদিও তিনি প্রথম জীবনে নারদনিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মার্কস-এঙ্গেলসের ভূমিকা সংবলিত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি প্লেখানভ রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। মার্কস-এঙ্গেলসের আরও অনেক রচনা অনূদিত হয় রুশে। ১৮৮৩ সালে রাশিয়ায় প্লেখানভই প্রথম 'ইমানসিপেশন অফ লেবার' নামে একটি মার্কসবাদী গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই গোষ্ঠীটি নারদনিকদের ভ্রান্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং গোটা দেশ জুড়ে মার্কসবাদের প্রসার ঘটায়। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে নারদনিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্লেখানভ বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, 'অন দি ডেভেলপমেন্ট অফ দি মনিস্টিক ভিউ অফ হিস্ট্রি'। লেনিনের মতে এই প্রবন্ধটি 'রাশিয়ায় মার্কসবাদীদের একটি গোটা প্রজন্মকে শিক্ষিত করেছে'। নারদনিকবাদকে পর্যুদস্ত করে রাশিয়ায় মার্কসবাদের অগ্রগতি ঘটল ঠিকই, কিন্তু প্লেখানভ কিছু গুরুতর ভুল করে বসলেন। নারদনিক দর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালালেও এর কিছু অবশেষ থেকে গিয়েছিল তাঁর চিন্তার মধ্যে, ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন। শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বাধীন বিপ্লবে কৃষক সমাজের সাহায্যকারী ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল না। তিনি ভাবতেন, উদারনীতিবাদী 'লিবারেল' বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষায় সাহায্য করে। সর্বোপরি, তৎকালীন অন্যান্য মার্কসবাদী গোষ্ঠীর মতোই তাঁর 'ইমানসিপেশন অফ লেবার' গোষ্ঠীটিরও শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন সম্পর্কে কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না।

প্লেখানভের ত্রুটিগুলি দূর করে মার্কসবাদের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনগুলি গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তায় লেনিনের উপর। বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়ার 'অপরাধে' ১৮ বছর বয়সেই লেনিন কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সেইসময় তিনি ফেদোসেভ প্রতিষ্ঠিত একটি মার্কসবাদী চক্রে যোগ দেন। পরে সামারায় চলে যাওয়ার পর সেখানে নিজেই তিনি এক মার্কসবাদী চক্র গড়ে তোলেন। ১৮৯৩-তে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে চলে যান। এরপর ১৮৯৫ সালে মার্কসবাদী চক্রগুলিকে একত্রিত করে তিনি 'লিগ অফ স্ট্রাগল ফর দি ইমানসিপেশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস' গঠন করেন এবং শ্রমিকদের নিয়ে একের পর এক গণবিক্ষোভ গড়ে তুলতে শুরু করেন। লেনিনই প্রথম সেদেশের শ্রমিক আন্দোলনগুলিতে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদের শিক্ষা নিয়ে আসেন। রাশিয়ায় তখনও পর্যন্ত নারদনিকবাদের প্রভাব ছিল এবং লেনিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হোয়াট দি ফ্রেন্ডস অব দি পিপ্‌ল আর অ্যান্ড হাউ দে ফাইট দি সোস্যাল ডেমোক্র্যাট'-এ এই তত্ত্বের ভুল কোথায়, তা ব্যাখ্যা করেন। তখন রাশিয়ায় প্লেখানভের গোষ্ঠী সহ সমস্ত মার্কসবাদী গ্রুপ ও চক্রগুলিকে যুক্ত করে একটি সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিক দল (সোস্যাল ডেমোক্রেসির সুবিধাবাদী, আপসমুখী চরিত্র তখনও পর্যন্ত উন্মোচিত হয়নি এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের অপসারণও ঘটেনি। তাই সেই সময় কমিউনিস্টদেরই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটস নামে

অভিহিত করা হত। — সম্পাদক) তৈরি করার চেষ্টা চলছিল। ঠিক সেই সময়েই, ১৮৯৭ সালে লেনিন গ্রেপ্তার হন। তাঁকে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকেও লেনিন কমরেডদের সাথে গোপনে যোগাযোগ রেখেছেন এবং বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। সেইসময় রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনগুলিতে 'অর্থনীতিবাদ'-এর ঝোঁক কাজ করছিল, যার ফলে রাজনৈতিক তত্ত্ব চর্চা এবং পার্টি গঠনের চেষ্টা বাদ দিয়ে শ্রমিকরা কেবল আর্থিক দাবিদাওয়া আদায়েই ব্যস্ত ছিল। সাইবেরিয়ার নির্বাসনে বসে এর বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন লেনিন।

ইস্ক্রার প্রকাশ

লেনিনের 'লিগ অব স্ট্রাগল ফর দি ইমানসিপেশন অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাস' ছিল একটি সর্বহারাশ্রেণির বিপ্লবী পার্টি গঠনের বুনিয়াদ। রাশিয়ার নানা শহরে লিগের শাখা গড়ে উঠেছিল; লক্ষ্য ছিল, রাশিয়ায় একটি ঐক্যবদ্ধ সর্বহারাশ্রেণির পার্টি গঠন করা।

১৮৯৮-এর মার্চে পুলিশের চোখ এড়িয়ে বেশ কিছু সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক সংগঠনের প্রতিনিধি মিন্‌স্কে প্রথম কংগ্রেসে মিলিত হন। সেখানে 'রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি' বা আর এস ডি এল পি গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়। যদিও পার্টি তখন গঠন করা যায়নি। লেনিন নির্বাসনে ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে কংগ্রেসের কাজকর্ম ব্যাহত হতে থাকে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরাও খুব শীঘ্রই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক সংগঠনগুলি আলাদা আলাদা ভাবে নিজেদের মতো করে কাজ করতে থাকে।

নির্বাসনে থাকাকালে লেনিন সমস্ত বিপ্লবী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি পার্টি গঠন করার বিস্তৃত পরিকল্পনা করেন। সেই সময়ে তিনি এমন একটি রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করলেন, যে পত্রিকাটি রাশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মার্কসবাদী গোষ্ঠী ও সংগঠনগুলির মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলবে এবং পার্টি গঠনের রাস্তা পরিষ্কার করবে।

নির্বাসন থেকে ফিরে এসে ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্লেখানভের সঙ্গে একত্রে লেনিন প্রকাশ করলেন 'ইস্ক্রা' (স্ফুলিঙ্গ) পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। প্রথম পাতায় লেখা ছিল — 'স্ফুলিঙ্গ থেকে সৃষ্টি হবে অগ্নিশিখা'। ইস্ক্রা ছাপা হত দেশের বাইরে এবং প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে চুপিসারে নিয়ে আসা হত রাশিয়ায়। পত্রিকা বিলি করতে গিয়ে কেউ ধরা পড়লে জারের কড়া নির্দেশে তার জেল অথবা নির্বাসন দণ্ড ছিল অবধারিত। কিন্তু এত করেও ইস্ক্রার প্রচার বন্ধ করা যায়নি। গোটা রাশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে পত্রিকার সংখ্যাগুলি। শহরে শহরে ইস্ক্রার পাঠক ও সমর্থকদের সংগঠন গড়ে ওঠে। ট্রান্সককেশিয়াতে এই ধরনের একটি সংগঠনের নেতা ছিলেন স্ট্যালিন। পরে তাঁর সম্পাদনায় জর্জিয়ায় প্রকাশিত হয় অপর একটি রাজনৈতিক পত্রিকা 'ব্রাডজলা'(সংগ্রাম)।

গঠিত হল আর এস ডি এল পি

লেনিনের ইস্ক্রা পত্রিকার সাফল্য পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৯০৩ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হল পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পার্টির কর্মসূচি নির্ধারণ ও গ্রহণ করা। আর এস ডি এল পি-র লন্ডন কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচিগুলি ছিল একটি সর্বহারাশ্রেণির বিপ্লবী পার্টির জঙ্গি আন্দোলনের কর্মসূচি। বলা হল, পার্টির লক্ষ্য, উৎপাদনের উপকরণের উপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ এবং শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অবলুপ্তি। এক কথায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। কর্মসূচিতে বলা হল, এই লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে হলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তুলতে হবে এবং সর্বহারাশ্রেণির রাজ কায়েম করতে হবে। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন, স্বৈরতান্ত্রিক জার শাসনের অবসান।

কিন্তু শুধুমাত্র কর্মসূচি গ্রহণ করলেই চলে না, পার্টির সাংগঠনিক রূপ কেমন হবে এবং কীভাবে পার্টি তার দায়িত্বগুলি পালন করবে — এ সম্পর্কে স্পষ্ট রূপরেখা গড়ে তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। পার্টির নিয়মকানুন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিল। এই বিষয়গুলি নিয়ে দ্বিতীয় কংগ্রেসে তুমুল বিরোধ বাধল। বিরোধ শুরু হল বিশেষ করে, পার্টির সদস্য কারা হতে পারবেন এবং কারা পারবেন না, তাই নিয়ে। দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টির মধ্যে দুটি গ্রুপ তৈরি হল। লেনিনের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীটি পরিচিত হল 'বলশেভিক' নামে এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীটির নাম হল 'মেনশেভিক'। প্রথম দিকে প্লেখানভ লেনিনের পক্ষে ছিলেন, পরে তিনি মেনশেভিকদের দিকে চলে যান।

মেনশেভিকদের দাবি ছিল, ধর্মঘটে অংশ নেওয়া প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি বিক্ষোভকারীকে নিজেদের পার্টি সদস্য হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার দিতে হবে, স্বাধীন মতের বিভিন্ন গ্রুপ ও ব্যক্তিকে পার্টিসদস্য করতে হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠের আনুগত্য স্বীকারের নীতিটি পরিত্যাগ করতে হবে। মেনশেভিকরা ছিলেন কেন্দ্রিকতার নীতির বিরোধী। স্বাধীন ব্যক্তিচিন্তার সমর্থক। দলটিকে তাঁরা ঢিলেঢালা গঠনের 'খভোটিস্ট' পার্টিতে পরিণত করার পক্ষে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া তখন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। ফলে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়িয়ে বহু সময় পার্টির কাজে সাহায্য করতেন। এই কারণে এঁদের পার্টি সদস্য করতে চেয়েছিলেন মেনশেভিকরা।

কিন্তু লেনিনের লক্ষ্য ছিল একটি বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণির পার্টি গঠন করা। মেনশেভিকদের অতি বিপ্লবীয়ানা ও নৈরাজ্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লেনিন শ্রমিকশ্রেণির একটি বিপ্লবী পার্টি তৈরি করতে চেয়েছিলেন যার কাঠামোটি হবে মানবদেহের মতো (মনোলিথিক)।

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন — (১) শ্রমিকশ্রেণি এবং শ্রমিকশ্রেণির পার্টি এক নয়। শ্রমিকশ্রেণির দল হল ওই শ্রেণির শ্রেণিসচেতন ও মার্কসবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত অগ্রগামী অংশ।

(২) শুধু অগ্রগামীই নয়, পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণির সংগঠিত অগ্রবর্তী বাহিনী। 'সংগঠনই হল সর্বহারাশ্রেণির একমাত্র হাতিয়ার'। তাই পার্টি সদস্যদের অবশ্যই কোনও না কোনও সংগঠনের সদস্য হতে হবে।

(৩) যথাযথভাবে কাজ করার জন্য এবং জনগণকে শৃঙ্খলার সাথে পথ দেখাবার জন্য শ্রমিকশ্রেণির পার্টিকে অবশ্যই কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত হতে হবে। অর্থাৎ দলে নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করতে হবে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

লখনউতে আশা কর্মীদের বিধানসভা অভিযান

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত উত্তরপ্রদেশ আশা কর্মী ইউনিয়নের আহ্বানে হাজার হাজার স্বাস্থ্যকর্মী ২৪ অক্টোবর লখনউতে বিধানসভা অভিযান করেন। আশা কর্মীদের সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি, তাঁদের নূন্যতম বেতন ১৮,০০০ টাকা করা সহ ৮ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে দেওয়া হয়।

বাঁকুড়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের জয়

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসে একটানা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়া এবং অন্যায়ভাবে বাড়তি বিদ্যুৎ বিল আদায়ের প্রতিবাদে বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার নেতৃত্বে এস ই ডি সি এল -এর বিষ্ণুপুর ডিভিশনাল ম্যানেজারের অফিসে ১৭ অক্টোবর বিদ্যুৎ গ্রাহকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। গ্রাহকদের দাবিগুলি যথার্থ বলে স্বীকার করে ডিভিশনাল ম্যানেজার অতি দ্রুত সেগুলির সমাধান করার আশ্বাস দেন। কোন বিষয়ে কাজের অগ্রগতি কতটা হচ্ছে, তা প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের জানানোর প্রতিশ্রুতিও দেন। ওই দিন বিষ্ণুপুর বাসস্ট্যান্ডে এক বিক্ষোভ সভায় অ্যাবেকার জেলা নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

হাবড়ায় কৃষকদের দাবি আদায়

গরিব কৃষকদের খাজনা মকুবের সার্টিফিকেট দেওয়া, পৌর এলাকার কৃষিজমির সরকার নির্ধারিত খাজনা গ্রহণ, জমির রেকর্ড করার ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা এবং রেকর্ড সরলীকরণের দাবিতে ২৪ সেপ্টেম্বর দুই শতাধিক কৃষক বিক্ষোভ দেখালেন উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দাবিগুলি মেনে নেন। অল ইন্ডিয়া কৃষক খেতমজুর সংগঠনের হাবড়া ব্লক-১ কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড কানাইলাল দাস। দাবি আদায়ের ফলে কৃষকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

মাথাভাঙায় ছাত্রী ধর্ষণ ঃ প্রতিবাদে বিক্ষোভ

২৯ অক্টোবর কালীপুজোর রাতে মাথাভাঙার হাজরাহাটে নবম শ্রেণির দুই ছাত্রী এলাকারই দুই যুবকের দ্বারা ধর্ষিতা হন। অপমানে একজন আত্মঘাতী হন। অন্যজন আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষী যুবকদের গ্রেপ্তারের ও শাস্তির দাবিতে ৩১ অক্টোবর কোচবিহারের এস পি অফিসে বিক্ষোভ দেখায় ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং এম এস এস। মাথাভাঙাতে এস ডি পি অফিসেও বিক্ষোভ দেখানো হয়।

নারী-শিশু নিগ্রহের প্রতিবাদ

পশ্চিম মেদিনীপুরের সাতসাই গ্রামের চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী ২২ অক্টোবর ধর্ষিতা হয়। পরদিন দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীও ধর্ষিতা হয়। প্রতিবাদে ২৫ অক্টোবর জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। স্মারকলিপিতে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তি, মদ ও পর্ণোগ্রাফি নিষিদ্ধ করা এবং নারী ও শিশুর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। নেতৃত্ব দেন এম এস এস-এর জেলা সম্পাদক কমরেড ঝর্ণা জানা এবং ডি এস ও-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস বিশ্বরঞ্জন গিরি ও তনুশ্রী বেজ।

নারায়ণগড়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা

অপসংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সুস্থ মনন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এআইডিওয়াইও নারায়ণগড় ৩ নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে ২৭-২৮ অক্টোবর সাইকাতে অনুষ্ঠিত হল ফুটবল প্রতিযোগিতা। মোট ১৬টি টিমের খেলা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডি ওয়াই ও সহ সভাপতি কমরেড চিত্ত পড়া, জেলা সম্পাদক কমরেড সূর্য পড়া, সুশান্ত পাণিগ্রাহী ও খোকন খাটুয়া। খেলার মাঠ দর্শক সমাগমে মেলার আকার ধারণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে কৃতীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে

যুব আন্দোলন তীব্রতর করার দৃপ্ত ঘোষণা

পাটনা শহর মিছিল অনেকেই দেখেছে। কিন্তু ২২ অক্টোবর দশ হাজারেরও বেশি যুবকের যে মিছিল দেখল, গুণগত দিক থেকে তার মান ছিল অনেক উঁচুতে। নিছক ভিড় নয়, সুশৃঙ্খল এই মিছিল ভারতীয় মহান বিপ্লবীদের স্বপ্ন ও শিক্ষা বুকে নিয়ে আওয়াজ তুলেছে নয়া সমাজ গঠনের। ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাত, প্রাদেশিকতাবাদ-আঞ্চলিকতাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজবাদের চেতনায় উদ্দীপ্ত এই যুবশক্তি দাবি তুলেছে, সকল বেকারের কাজ চাই, নারী নিগ্রহ বন্ধ কর, নৈতিক অবক্ষয় রোধ কর, সাম্প্রদায়িকতা নিপাত যাক।

অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল এই মিছিল। সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির প্রাঙ্গণে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা এই

প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

অগ্রগামী যুবশক্তি অঞ্জুমান ইসলামিয়া হলের সামনে থেকে মিছিল করে সমাবেশ স্থলে পৌঁছায়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মুদুলা মিশ্র। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমি এই সংগঠনের সঙ্গে নীতিগতভাবে এবং আবেগের সাথে যুক্ত। এই সম্মেলন যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছে তা একটা দেশের অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান বলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার কাজের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল? কেন যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়, কমরেড সত্যবান তা গভীরভাবে ভাবার আবেদন জানিয়ে বলেন, পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে হলে সঠিক আদর্শ নিয়ে সঠিক পথে যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রতিভা নায়ক বলেন, এ আই ডি ওয়াই ও বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় বলীয়ান একটি সংগ্রামী যুব সংগঠন, যা দেশের মাটিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধানের পরিপূরক যুব আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠন ইতিমধ্যেই ২৬টি রাজ্যে বিস্তৃত হয়েছে।

সংগঠনের সহ সভাপতি কমরেড দীপক কুমার বলেন, দেশের জনশক্তির ৬৬ শতাংশের বেশি বেকার, এই সমস্যা দূরীকরণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা নেই।

বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি কমরেড উজ্জ্বল রায়, এ আই ডি এস ও-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অংশুমান রায় সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহসভাপতি কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান।

অসুস্থতার কারণে প্রতিনিধি অধিবেশনে উপস্থিত হতে না পেরে লিখিত বার্তা পাঠান এস ইউ সি আই (সি) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী। সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানোর জন্য যুবশক্তির ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি ডি ওয়াই ও-কে যোগ্য ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান, যাতে সরকারের ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিস্ট আক্রমণ ব্যর্থ করা যায়। এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছিল তুরস্কের কমিউনিস্ট ইয়ুথ অর্গানাইজেশন।

ডি ওয়াই এফ আই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড অভয় মুখার্জী বার্তা পাঠান। এ আই ওয়াই এফের সভাপতি কমরেড আফতাব আলম তাঁর বক্তব্যে যুক্ত বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর জোর দেন। সম্মেলনে কমরেড রামনজনাপ্পাকে সভাপতি এবং কমরেড প্রতিভা নায়ককে সম্পাদক করে ৭৮ জনের অল ইন্ডিয়া কমিটি গঠিত হয়।

নতুন কমিটির উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশক বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি বলেন, সমাজে যখন সংকটের ঘন মেঘ দেখা দেয়, অগ্রগতি হয় রুদ্ধ, যুবকরাই তখন এগিয়ে আসেন প্রতিকারের দাবি নিয়ে। ডি ওয়াই ও-কে এই ভূমিকা পালন করতে হবে। সেজন্য নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিজেদের উন্নত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

চারের পাতার পর

নিম্নতর বডিগুলিকে উচ্চতর বডির কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। পার্টির সমস্ত স্তরের নেতা ও কর্মীরা দলীয় শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য থাকবেন।

(৪) সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ হল পার্টি। পার্টিই অন্যান্য সমস্ত সংগঠনকে নেতৃত্ব দেবে। তাই উন্নত তত্ত্বে বলীয়ান, শ্রেণিসংগ্রামের নিয়মকানুন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, শ্রমিকশ্রেণির সবচেয়ে এগিয়ে থাকা অংশকে নিয়ে পার্টি গঠিত হবে।

(৫) শ্রমিক জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ থাকা অত্যন্ত জরুরি, তা না হলে তার অগ্রগতি ঘটবে না।

(৬) পার্টি কখনই 'খ্‌ভোটিস্ট' দলে পরিণত হবে না। ঘটনাবলিকে নিজের গতিতে চলতে দিয়ে পার্টি স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর করে ঘটনার লেজ ধরে চলবে না। লেনিন দেখিয়েছেন, "বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না। কেবলমাত্র সর্বোন্নত তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হলে তবেই একটি পার্টি শ্রমিকশ্রেণির অগ্রগামী সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে পারে। ...স্বতঃস্ফূর্ততার উপাসক যারা, যারা সচেতনতার ভূমিকাকে খাটো করে দেখে, পার্টির ভূমিকাকে তুচ্ছ করে, তারা এর দ্বারা নিজেরা চাক বা না চাক শ্রমিকদের মধ্যে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব বাড়তেই সাহায্য করে।"

১৯০০ সালে 'ফাইট ফর দ্য ভ্যানগার্ড পার্টি' প্রবন্ধে মহান লেনিন রাশিয়ায় যথার্থ মার্কসবাদী দল গঠনের প্রাথমিক পর্বে কী করণীয় সেটা নির্দেশ করে লিখেছিলেন, 'পার্টির প্রতিষ্ঠা করা ও তাকে সংহত করার অর্থ হচ্ছে রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের (সে সময়ে মার্কসবাদীদের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট বলা হত) মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা। এই ঐক্য ও সংহতি ডিক্রি জারি করে আনা যাবে না, কিংবা প্রতিনিধিদের সভায় প্রস্তাব-সিদ্ধান্ত পাশ করিয়েও আনা যাবে না। ঐক্য আনার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ করতেই হবে। সর্বপ্রথমে, চিন্তার (আইডিয়াজ) ঐক্য আনা প্রয়োজন, যা রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে বর্তমানে যে মতপার্থক্য ও বিভ্রান্তি রয়েছে তা দূর করবে। ...অন্যথায় আমাদের ঐক্য হবে মেকি ঐক্য, যা বর্তমান বিভ্রান্তিগুলিকে আড়াল করবে ও সেগুলির সম্পূর্ণ অপসারণে বাধা দেবে'। লেনিন যে পার্টি গঠনের আগে ইউনিটি অফ আইডিয়াজ বা চিন্তার ঐক্য গড়ে তোলার সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছিলেন, সেটা নিছক বিপ্লবের কর্মসূচি নির্ধারণ করা নয়, তিনি মার্কসবাদকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের অপরিহার্য প্রয়োজনে মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি, বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদের বিশেষীকরণ বা কংক্রিটাইজেশন, বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিপরীতে কমিউনিস্ট সংস্কৃতির ধারণা গড়ে তোলা, যৌথ নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক একেন্দ্রিকতা গড়ে তোলা— এই সামগ্রিক ক্ষেত্রে ইউনিটি অফ আইডিয়াজ গড়ার সংগ্রামের কথাই বুঝিয়েছিলেন। যা আমরা লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশ্লেষণ থেকে পেয়েছি।

'ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড, টু স্টেপস্ ব্যাক' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লেনিন মার্কসবাদের ইতিহাসে প্রথমবার পার্টির ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি দেখান, সর্বহারাশ্রেণির নেতৃত্বকারী সংগঠন পার্টি হল তাদের প্রধান হাতিয়ার, যেটি ছাড়া শ্রমিকশ্রেণির কোনও বিপ্লব, সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কোনও সংগ্রামই সম্ভব নয়।

রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক সংগঠনগুলির বেশিরভাগই বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দল। কমরেড স্ট্যালিন সেই সময় ছিলেন জেলে। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি জানার পর তিনি লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের পক্ষেই দৃঢ় সমর্থন জানালেন।

এরপর বলশেভিকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে। ১৯০১-০৪ এই সময়টায় রাশিয়ায় আন্দোলনের বিপুল অগ্রগতি ঘটেছিল। ১৯০৪-এ শুরু হল রুশ-জাপান যুদ্ধ। জারের সরকারের আশা ছিল, এই যুদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার রুখে দেবে। কিন্তু তাদের সেই আশায় ছাই দিয়ে বলশেভিকরা ১৯০৪-এর ডিসেম্বর মাসে বাকু তৈলক্ষেত্রে একটি বিশাল ধর্মঘট সংগঠিত করল। এর প্রভাবে গোটা দেশ জুড়ে ধর্মঘটের বান ডাকল। এই ধর্মঘটগুলি যেন বজ্রনির্ঘোষে আসন্ন বিপ্লবের আগমনবার্তা ঘোষণা করে গেল।

১৯০৫-এর প্রথম বিপ্লবী অভ্যুত্থান

মেনশেভিকরা জারের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছিল এবং উদারনৈতিক বুর্জোয়াশ্রেণির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছিল। লেনিন কিন্তু ১৯০৫-এ রাশিয়ার এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে অন্যভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এটা ঘটছে এমন সময়ে যখন বিশ্ব পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌঁছে গেছে। তাই তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, "এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণির ভূমিকা হচ্ছে নেতার ভূমিকা"। তাঁর অভিমত ছিল, জয়লাভের জন্য এই বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া জরুরি। বলশেভিকরা তাই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জারতন্ত্র ধ্বংস করে শ্রমিক-কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। মেনশেভিকের পক্ষ থেকে প্লেখানভ সাধারণ মানুষের অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানালেন। মেনশেভিকদের এই বিশ্বাসঘাতকার সুযোগ নিয়ে স্বৈরাচারী জার শাসন বিপ্লবী আন্দোলনের উপর ভয়ানক আক্রমণ চালাল। বিপ্লবী অভ্যুত্থান প্রত্যাহার করা হল। লেনিন বললেন, "১৯০৫-১৯০৭ — এই তিন বছরের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দ্বারা রাশিয়ার সর্বহারাশ্রেণি নিজের জন্য এবং রুশ জনসাধারণের জন্য যে সুবিধাগুলি অর্জন করেছে, তা জয় করতে অন্যান্য দেশের কয়েক যুগ লেগেছে। এই লড়াই বিশ্বাসঘাতক, ঘৃণিত ও জরাগ্রস্ত উদারনীতিবাদের প্রভাব থেকে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি নিয়ে এসেছে। ... এটি রাশিয়ার সমস্ত শোষিত নিপীড়িত শ্রেণিকে বিপ্লবী গণসংগ্রাম গড়ে তোলার সামর্থ্য জুগিয়েছে"। রাশিয়ার এই প্রথম বিপ্লব সফল হতে না পারলেও গোটা বিশ্ব জুড়ে মানুষের মুক্তি সংগ্রামের বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

এই অসফল বিপ্লবটিই রাশিয়াকে বিশ্ববিপ্লবের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করে এবং লেনিনের বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত রাশিয়ার সর্বহারাশ্রেণি বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। জনসাধারণের চোখে লেনিন রাশিয়ার বিপ্লবের প্রধান তাত্ত্বিক, সংগঠক ও নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। কিন্তু ১৯০৫ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতা মানুষের মনে হতাশারও জন্ম দিয়েছিল। লেনিনের মহান প্রেরণাদায়ক নেতৃত্বই জনগণকে নিরাশার কবল থেকে মুক্তি দিয়ে সর্বহারাশ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য নতুন করে উজ্জীবিত করেছিল। বিপ্লব শক্তিশালী করার একমাত্র লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামের নানা টানাপোড়েন ও জটিলতার মধ্যে পথ কেটে চলতে হয়েছিল লেনিনকে।

এই প্রসঙ্গে, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে রাশিয়ার পার্লামেন্ট 'ডুমা'য় অংশগ্রহণ করা ও আরেকটি পরিস্থিতিতে, অংশগ্রহণ না-করার যে সিদ্ধান্ত তাঁর দলকে নিতে হয়েছিল এবং এই সিদ্ধান্তের মধ্যে মার্কসবাদী বিচারধারার যে অসামান্য নিদর্শন ছিল তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ডুমা' কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান ছিল না। এটা ছিল জারের বিতর্কসভা এবং প্রশাসনের মূল কাজকর্মের ওপর ডুমার কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। অবশ্য ডুমার কিছু আসন শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

স্বৈরাচারী জারের শাসন উৎখাত করার জন্য ১৯০৫-এ বিপ্লবী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা তখন ডুমা বয়কট করেছিল। কিন্তু বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর যখন জনগণের মনে হতাশা, তখন লেনিন ডুমায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ডুমায় অংশ নিয়ে বিপ্লবীরা জনসাধারণের সামনে চলতি ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করুক, ডুমা সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটে জনগণ বিপ্লবের সমর্থনে এগিয়ে আসুক। এভাবেই লেনিন দেখালেন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনে, দুটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে মার্কসবাদীদের সিদ্ধান্তও ভিন্ন হয়ে যায়। তিনি বললেন, "...(১৯০৫ সালে) বুলিগিন ডুমা বয়কটের কৌশলটি ছিল সেই পরিস্থিতিতে একমাত্র সঠিক কৌশল। ...সময় এসেছে যখন বিপ্লবী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের অবশ্যই বয়কটের রাস্তা পরিত্যাগ করতে হবে। ১৯০৬-এর দ্বিতীয় ডুমা যখন গঠিত হবে (এবং যদি গঠিত হয়), তখন তাতে যোগ দিতে আমরা অস্বীকার করব না" (কালেকটেড ওয়ার্কস, ভলিউম ২, পৃঃ ১৪২-৪৫)। লেনিন আরও শিখিয়েছেন যে, "কখনও সংসদীয় আবার কখনও অ-সংসদীয় সংগ্রাম, কখনও সংসদে অংশ নেওয়া কখনও তা বয়কট করার কৌশল এবং এইভাবে সংগ্রামের বিভিন্ন রূপের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ — সবগুলির মধ্যেই অসাধারণ সম্পদ ছিল...। ১৯০৫ সালে বলশেভিকদের পার্লামেন্ট বয়কট করার ঘটনা বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণিকে অমূল্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে এবং দেখিয়েছে যে, আইনসঙ্গত ও বেআইনি, সংসদীয় ও অ-সংসদীয় ধরনের আন্দোলনগুলিকে যখন সংযোজিত করা যায়, তখন কখনও কখনও আন্দোলনের সংসদীয় রূপ পরিত্যাগ করা ভালই শুধু নয়, তা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। তবে এই অভিজ্ঞতাকে নকল করে, বিচার-বিবেচনা ছাড়াই ভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্ধভাবে প্রয়োগ করলে চূড়ান্ত ভুল করা হবে...। বলশেভিকরা সর্বহারাশ্রেণির পার্টির 'কোর'কে (শক্তিশালী ও উন্নত করা দূরে থাক) রক্ষাই করতে পারত না, যদি তারা কঠোর সংগ্রামের দ্বারা এই দৃষ্টিভঙ্গি বজায় না রাখতে পারত যে, আইনি ও বেআইনি দুই রূপেই সংগ্রাম চালানো অবশ্যকর্তব্য এবং এমনকী চরম প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেন্টে অংশ নেওয়াও অবশ্যকর্তব্য।" (লেফ্‌ট উইং কমিউনিজম অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিসঅর্ডার)।

আজকের দিনে যখন পার্লামেন্টের ভিতরের আন্দোলনের সাথে বাইরের আন্দোলনকে সংযোজিত করার বিষয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে, তখন লেনিনের এই শিক্ষা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যতদিন পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ গোটা দেশকে ভাসিয়ে না দিচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতি সম্পর্কে জনসাধারণের মোহমুক্তি না ঘটছে, ততদিন সংসদ বহির্ভূত আন্দোলনের কণ্ঠ সংসদের মধ্যে প্রতিফলিত করার জন্য সংসদীয় সভাকে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করার প্রয়োজন থাকবে। পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্নে বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা যে নেহাতই অসার — সংসদে অংশগ্রহণের দ্বারা এই সত্য সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ ও সচেতন করা যায়। বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণ যখন শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে আসবে, কেবল তখনই সংসদীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ফুরোবে এবং পার্লামেন্ট বর্জন করার সময় উপস্থিত হবে।

ক্রমশ

- মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষের ডাক, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক
- মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেই রয়েছে শোষণমুক্তির পথ
- মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় বলীয়ান হয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের শপথ নিন
- পুঁজিবাদ মানে হতাশা, সমাজতন্ত্র মানে প্রেরণা
- মহান নভেম্বর বিপ্লবের পতাকা হাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে চলুন

পঞ্চম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর সিদ্ধান্ত লাগাতার আন্দোলনের ফসল

পঞ্চম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু এবং দশম শ্রেণিতে সি বি এস ই বোর্ডে মাধ্যমিক পরীক্ষা আবশ্যিক করার যে সিদ্ধান্ত সরকার নিতে যাচ্ছে তা আদায় করার জন্য যে লাগাতার আন্দোলন চলেছে তাতে ছাত্র সংগঠন

২৮ অক্টোবর। মাইশোর, বাঙ্গালোর

এআইডিএসও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। ডি এস ও-র দাবি, প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করতে হবে। এই দাবিতে ২৫ অক্টোবর সারা ভারত দাবি দিবস পালিত হয়। এ দিন সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরকে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করা হয়— প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করতে হবে।

শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা বিলোপ করে ঢালাও প্রমোশন নীতি চালু করা হয় এবং সিবিএসই বোর্ডে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেও 'ঐচ্ছিক' করা হয়। এই নীতি বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত্তিকে ধসিয়ে দেবে এটা উপলব্ধি করেই এ আই ডি এস ও ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে। ডি এস ও-র যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের প্রভাবে শাসকদলগুলির নানা বিভ্রান্তি কাটিয়ে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী সহ সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনের সাথে সহমত হন। ধীরে ধীরে একটা সর্বজনীন দাবি হিসাবে পাশ-ফেল চালুর বিষয়টি সমাজে এসে যায়। ধারাবাহিক আন্দোলনের এই চাপের ফলেই কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বাধ্য হয়ে পাশ-ফেল বিতাড়ন নীতি খতিয়ে দেখার জন্য তিনটি কমিটি গঠন করে। কমিটি বিভিন্ন সমীক্ষা রিপোর্টে দেখতে পায়, সরকারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম শ্রেণির বাংলা ঠিকমতো পড়তে পারছে না, অঙ্কও করতে পারছে না। এই সব ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি নিয়মের সুযোগ নিয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও পরবর্তী বোর্ড পরীক্ষায় তাদের ফল হচ্ছে খুবই মারাত্মক। এই পরিস্থিতিতে কমিটি সঠিক ভাবেই সুপারিশ করেছে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনা জরুরি। কিন্তু প্রথম শ্রেণি থেকে তা ফিরিয়ে আনতে এখনও চলছে সরকারি স্তরে নানা টালবাহানা। কেন? অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার এই সর্বনাশা নীতি গ্রহণ করেছে কেন্দ্রের মনমোহন সিং পরিচালিত কংগ্রেস সরকার। তাকেই রাজ্যে রাজ্যে প্রয়োগ করেছে

২৫ অক্টোবর। আগরতলা, ত্রিপুরা

কোথাও বিজেপি, কোথাও সিপিএম, বা অন্য কোনও আঞ্চলিক দল। এ রাজ্যে পূর্বতন সিপিএম সরকার পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেয়। তৃণমূল তুলে দেয় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। নিজেদের মধ্যে পার্থক্য যাই থাক, এই সব দল পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন সহমত? পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার নীতি আসলে শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণেরই দরজা খুলে দেবে, যা পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থে এরা সকলেই চায়। পঞ্চম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর যে সিদ্ধান্ত সরকার নিতে যাচ্ছে তা ডি এস ও-র দীর্ঘ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ জয়।

তৃণমূল শাসনে ১৪ বার বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি, প্রতিবাদ অ্যাবেকার

পুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই রাজ্যের তৃণমূল সরকার আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়াল। এ নিয়ে তৃণমূল শাসনে ১৪ বার মাশুল বাড়ল। ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার সময় বন্টন এলাকায় গড় বিদ্যুৎ মাশুল ছিল ৪.২৭ টাকা। এখন তা দাঁড়িয়েছে ৬.৮৯ টাকা। সাড়ে পাঁচ বছরে মাশুল বেড়েছে ২.৬২ টাকা। বৃদ্ধির হার ৬০ শতাংশেরও বেশি। অথচ তৃণমূল নেত্রী বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলে তারা বিদ্যুতের মাশুল বাড়াবেন না।

পূর্বতন সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের শাসনের এমভিসিএ (মাস্থলি ভ্যারিয়েবল কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট) প্রয়োগ করেই তৃণমূল সরকার এভাবে মাশুল বৃদ্ধিতে সিলমোহর দিচ্ছে। অবশ্য ভাঙা রেকর্ডের মতো এবারও বলা হচ্ছে, বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির লোকসান হচ্ছে। অথচ বাস্তব হল, তাদের মুনাফা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার বক্তব্য ১৬ শতাংশেরও বেশি মুনাফা রেখে বিদ্যুতের মাশুল নির্ধারিত হয়, তাহলে লোকসান হয় কী করে?

মাশুল বৃদ্ধি প্রসঙ্গে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুত চৌধুরী ২৯ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, গত আগস্ট মাসে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি ও সি ই এস সি-তে এম ভি সি এ-এর নামে মাশুলবৃদ্ধির ঘা শুকোতে না শুকোতেই শারদোৎসবের সুযোগে জনসাধারণকে দীপাবলির 'উপহার' হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন পুনরায় দুই কোম্পানিতেই বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বৃদ্ধি গত এপ্রিল মাস থেকে কার্যকর হবে। ফলে গ্রাহকদের উপর ৭ মাসের বিপুল বকেয়ার বোঝা চাপবে। এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল জিনিসের দাম বাড়বে, জনসাধারণের দুর্ভোগও বাড়বে পাল্লা দিয়ে। অ্যাবেকার দাবি, অবিলম্বে মাশুলবৃদ্ধির এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। নতুবা কলকাতা সহ সারা রাজ্যে প্রতিরোধ আন্দোলন হবে।

সংকটের সমাধান পাচ্ছেন না পণ্ডিতরা

একের পাতার পর

মধ্যে প্রবল ক্ষোভের জন্ম দেবে। সেই ক্ষোভ সবার আগে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই ফেটে পড়বে। রাষ্ট্র তাকে সামাল দেবে কীভাবে? মিথ্যা স্তোকবাক্য, সাম্প্রদায়িকতার জিগির, জাতপাত-বর্ণের ভেদাভেদে ইন্ধন— কোনও কিছু দিয়েই তাকে আটকে রাখা যাবে না।

বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তা থেকে সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক সকলেই কিন্তু অসাম্যবৃদ্ধির আসল কারণটিকে গোপন করে প্রযুক্তির উপর দোষ চাপাচ্ছেন। উন্নত প্রযুক্তি মানে তো অধিক কর্মক্ষমতা, অধিক উৎপাদন। অধিক উৎপাদন সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর হবে কেন? সমাজে কি মানুষের সমস্ত প্রয়োজন মিটে গেছে যে, এর বেশি উৎপাদন হলে তা মানুষের কাজে লাগবে না? সরকারের তথ্যই বলছে, দেশের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষের দৈনিক রোজগার কুড়ি টাকার কম। ষাট ভাগ মানুষ বেকার কিংবা অর্ধবেকার। বিরাট সংখ্যক মানুষ আজও অর্ধাহারে অনাহারে থাকে, মাথার ওপর ছাদ জোটে না, ফুটপাথে খোলা আকাশের নিচে বাস করে। শীতে পোশাক জোটে না, রোগে ওষুধ জোটে না, শিক্ষার অভাবে, অন্ধবিশ্বাসে, কুসংস্কারে অমানুষের জীবনযাপন করে। শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে আজও অসংখ্য প্রসূতি-মা মারা যান, আর জন্মালেও অপুষ্টিতে মরে বিরাট সংখ্যক শিশু। মানুষের দুঃখ-কষ্টের তালিকা বাস্তবে আরও লম্বা। তবুও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠছে কেন? কারণ বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিকদের উৎপাদনের উদ্দেশ্য মানুষের প্রয়োজন মেটানো নয়, তাদের মুনাফাকে আরও বাড়িয়ে তোলা। বুর্জোয়া পণ্ডিতরাও আজ আর এ কথা অস্বীকার করতে পারছে না যে, বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই এই ভয়ঙ্কর সংকট জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু এর হাত থেকে রেহাইয়ের রাস্তা তাঁরা দেখাতে পারছেন না। তা তাঁরা পারবেন না। কারণ যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই সংকটের জন্ম দিয়ে চলেছে, তাকে টিকিয়ে রেখে এই সংকটের সমাধান হতে পারে না। উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিমালিকানা এবং শোষণকে চিরতরে বন্ধ করেই একমাত্র এই সংকটের সমাধান হতে পারে। বহু আগেই মহান কার্ল মার্কস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সমাধানের এই রাস্তাটি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু যে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণি গোটা সমাজের সকলের পরিশ্রমের ফলকে আত্মসাৎ করে সম্পদের পাহাড়ে বাস করছে, তারা কি এমন সমাধান চাইতে পারে? তারা চায় মৃত্যুপথযাত্রী, চরম সংকট-জর্জরিত এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যতদিন সম্ভব চালিয়ে নিয়ে যেতে। এই লক্ষ্য থেকেই তাদের মাইনে করা বিশেষজ্ঞরা নানা টোটকার নিদান দিয়ে চলেছে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যেমন অনেকে জড়িবুটি, ঝাড়ফুঁক, জলপড়া, তুলসীতলার মাটি দিয়ে রোগীকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে, এই পুঁজিবাদী বিশেষজ্ঞরাও তেমনই 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া' 'বেকারদের প্রশিক্ষণ' প্রভৃতি টোটকার ব্যবস্থা দিচ্ছে। কিন্তু তাতেও সংকট কমেনি, বরং বেড়ে চলেছে।

বাস্তবে আজ প্রয়োজন, যে ব্যবস্থা গোটা সমাজ-সভ্যতাকে এমন এক ভয়ঙ্কর সংকটের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে, সমস্ত শোষিত মানুষের ঐক্য গড়ে তুলে শ্রমিক শ্রেণির সঠিক নেতৃত্বে প্রবল গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাকে উৎখাত করা। সমাজতন্ত্র ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটিয়ে যৌথ মালিকানা কায়েম করে পরিকল্পিত অর্থনীতির সাহায্যে এই সংকটের স্থায়ী সমাধান করে দেখিয়ে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রে প্রযুক্তিকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তা কখনও কর্মসংকোচন ঘটায়নি। বরং কর্মের নতুন নতুন ক্ষেত্রকে খুলে দিয়েছে। কারণ সেখানে উৎপাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের মানুষের প্রয়োজন মেটানো। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি দ্রুত তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে এবং দেশের মানুষের জীবনমানের প্রভূত উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কার্ল মার্কসের চিন্তাকে রাশিয়ায় প্রথম কাজে পরিণত করেছিলেন মহান লেনিন। পরবর্তীকালে সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ-চক্রের হাত ধরে সমাজতন্ত্রের নীতি থেকে বিচ্যুতিই সেখানে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছিল। এই দেশগুলিতে শোষিত মানুষ পুনরায় সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে সংগ্রাম করছে। নভেম্বর বিপ্লবের থেকে শিক্ষা নিয়ে এ দেশের বুকে পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামকে শক্তিশালী করাই নভেম্বর বিপ্লবের শর্তবর্ষ উদযাপনের সার্থকতা।

ছাত্র-যুব-মহিলাদের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

বিদ্যাসাগর ও শরৎচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৪ অক্টোবর সরশুনায় শিশুদের হাতে বস্ত্র তুলে দিচ্ছেন ডিওয়াইও রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর

কোচবিহার ও তমলুক লোকসভা উপনির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে

কোচবিহার লোকসভা উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নৃপেন কার্যী।

তমলুক লোকসভা উপনির্বাচনে দলের প্রার্থী কমরেড দিলীপ মাইতি। ২৬ অক্টোবর তমলুক এস ডি ও দপ্তরে কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে গিয়ে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন। ২৮ অক্টোবর তমলুক মানিকতলা থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত শতাধিক কর্মী-সমর্থক প্রার্থীকে নিয়ে মিছিল করেন। পুঁজিপতি শ্রেণির দুই বিশ্বস্ত দল দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক বিজেপির বিরুদ্ধে এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী বামপন্থার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরতে এবং গণআন্দোলন তীব্রতর করতে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

আফ্রিকায় বিশ্ব শ্রমিক সম্মেলনে পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামের শপথ

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নের ১৭তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৫-৮ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে। বিশ্বের ১১১টি দেশের ২৪৪টি ট্রেড ইউনিয়নের ১৫২০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের (এ আই ইউ টি ইউ সি) পক্ষে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা, সহ সভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। বক্তব্য রাখেন কমরেড শঙ্কর সাহা।

ডব্লিউ এফ টি ইউ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাছে ফ্যাসিস্ট হিটলার বাহিনীর পরাজয়ের পর বিশ্বে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনকে প্রবাহিত করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এই আন্দোলনগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রয়োজন থেকেই তদানীন্তন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে ডব্লিউ এফ টি ইউ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড শঙ্কর সাহা

এই সংগঠনে এ আই ইউ টি ইউ সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পুঁজিবাদের সংকট কেন অনিরসনীয়, দেশে দেশে স্বতস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ সত্ত্বেও সঠিক নেতৃত্বের অভাবের জন্যই যে তা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ শ্রমিক জীবনে সংকট বৃদ্ধি করা ছাড়া যে আর কিছু করতে পারে না, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের মধ্যেই রয়েছে সংকট সমাধানের পথ, এই সংগ্রামে শ্রমিককে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে নিজেকে পাল্টাতে হবে, সংশোধনবাদ এই সংগ্রামে ভাটার সৃষ্টি করছে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কমরেড শঙ্কর সাহা সঠিক মতাদর্শ তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সম্মেলনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, সমস্ত প্রতিনিধিই পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্মেলনে মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মিথ্যা মামলায় চিকিৎসকদের ফাঁসানোর প্রতিবাদে ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ

এন আর এস মেডিকেল কলেজের সামনে বিক্ষোভ সভা। ২৬ অক্টোবর

দুয়ের পাতার পর

অধ্যাপক ডি পি চক্রবর্তী। ডাঃ অংশুমান মিত্র, ডাঃ ঝোটন দাস, ডাঃ সজল বিশ্বাস, সিস্টার পার্বতী পাল প্রমুখ। আইনের অপব্যবহার ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চিকিৎসকদের হয়রানির বিরুদ্ধে বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে স্মারকলিপি দেন চিকিৎসকরা।

সাক্ষাৎ চেয়ে চিঠিরও জবাব দেন না মুখ্যমন্ত্রী

অভিযোগ উঠল বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলনে

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল অবিলম্বে প্রত্যাহার করা, ৫০ শতাংশ মাশুল কমানো ও পরিষেবার উন্নতির দাবিতে অ্যাবেকার ডাকে ২৪ অক্টোবর কলকাতার মহাজাতি সদনে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকা সহ রাজ্যের সকল জেলা থেকে মোট ১,৫১০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কুণাল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে পাঁচ জনের সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করে। শোক প্রস্তাব পেশ করেন সুশান্ত পাত্র। মূল প্রস্তাব পেশ করেন অনুকূল ভদ্র। সমর্থন করেন শঙ্কর মালাকার। সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী। অধিবেশনে মানবাধিকার কমিশনের পূর্বতন চেয়ারম্যান এবং অ্যাবেকার অন্যতম উপদেষ্টা বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন অ্যাবেকার বিগত দিনের আন্দোলনে বিশেষ করে ২০০৫ সালে পুলিশের গুলিচালনা ও অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, আজকের এই বিশাল সমাবেশের মধ্য দিয়ে অ্যাবেকার শক্তি বৃদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে। অ্যাবেকার আন্দোলনের সাথে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী একাত্মতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। একই সাথে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনস্বার্থের পরিপন্থী বিদ্যুৎ নীতির পরিবর্তনের দাবিতে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে সুলভে বিদ্যুৎ প্রদানের দাবিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর দৃঢ় সমর্থন প্রকাশ করেন। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক প্রদীপকুমার দত্ত, শঙ্কর পাল, মানিক বর্মণ, রবীন দেবনাথ, জগন্নাথ দাস, রাম সাহু, জয়মোহন পাল, সায়গল সরকার, মদন আচার্য, শীতাংশু তপাদার, শিক্ষক এল এম শর্মা প্রমুখ প্রতিনিধি। প্রথম অধিবেশনের প্রধান বক্তা অ্যাবেকার অন্যতম সহ সভাপতি অমল মাইতি বলেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর সরকার বিগত সরকারের মতো বিদ্যুৎ মাশুল বাড়াবে না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বিগত সরকারের নীতিই

অনুসরণ করে ১৩ বার মাশুল বাড়ানো হয়েছে। এমনকী অ্যাবেকার পক্ষ থেকে সাক্ষাৎ চেয়ে বার বার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তিনি কোনও চিঠির উত্তর দেওয়ারও সৌজন্য দেখাননি। আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলে দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম তীব্রতর করার আহ্বান জানান তিনি। ৪৬ দফা দাবিসনদ সহ মূল প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। যে সব জেলায় বা অঞ্চলে সম্মেলন হয়নি, সেখানে অবিলম্বে সম্মেলন করা, পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে কাস্টমার কেয়ার ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং মাশুল বৃদ্ধি ঘোষণা হলেই কলকাতা সহ সর্বত্র বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনে সঞ্জিত বিশ্বাসকে সভাপতি এবং প্রদ্যুৎ চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত করে ১৩৩ জন সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। বিশিষ্ট আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে পরিচালিত সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচনাসভার বিষয় ছিল 'বিদ্যুৎকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে এনে কম দামে নিরবচ্ছিন্নভাবে সকলের ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব'। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অনুকূল ভদ্র, কুণাল বিশ্বাস ও প্রদ্যুৎ চৌধুরী প্রমুখ নেতৃত্ব। সঞ্জিত বিশ্বাস গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন থাকায়, গ্রাহকদের প্রতি তাঁর রেকর্ড করা আবেদন সম্মেলনে শোনানো হয়।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবার্ষিকীর সূচনায়

কেন্দ্রীয় জনসভা

৭ নভেম্বর, ২০১৬
মন্ডলস্কর হল, নয়াদিল্লি

সভাপতি ঃ কমরেড রণজিৎ ধর, সদস্য পলিটব্যুরো
বক্তা ঃ কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সদস্য পলিটব্যুরো

মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে

কলকাতায় সভা

১৪ নভেম্বর, ২০১৬
মহাজাতি সদন, কলকাতা

বক্তা ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, সদস্য পলিটব্যুরো
সভাপতি ঃ কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদক

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org